*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VI, Issue-I, July 2019, Page No. 40-45*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019.40-45**

# স্বদেশপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দ: এক সমীক্ষা

**শেলী দত্ত**
*গবেষিকা (পি.এইচ. ডি), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম*

**Abstract**

*In the profound labyrinthine wilderness of the history of Indian tradition from where the sound of triumphant ovation was once aroused, those Indians are now in a frenzy of attaining their own desires. The society has now been coiled around by the mass-hysteric of illogicalness- and the Indian people are becoming inert and devoid of any inherent wisdom, rather they are besotted with Occidentalism.*

*Accordingly, when the postcolonial Indian society was getting repulsed by the grandiose wave of glassy westernization and was distressed to a great extent too. At that time, by virtue of the peerless genius of Swami Vivekananda, the revival of the National awakening became passible. The people of Indian finally became able to envisage that glorious and immortal image of Indian where once the maxim of self-sacrifice was echoed through. Hence we can assert that Swamiji was indeed a religious leader and at the same time he was a social reformer, thinker, himself the epitome of the Zeitgeist, and also a revolutionary. In the wards of Narayan Gangopadhyay, Swami Vivekananda was the first ever socialist thinker in India. This dissertation in question owes to these words while highlighting the role of Swami Vivekananda as patriotism.*

***Keywords: Thinking of Vivekanda, National Life, Socialism, Patriotism, Young stars, Social structure, Humiliation of humanity.***

---

*‘মেঘের আড়ালে সূর্য ক্ষণিক ঢাকলে*
*আকাশে ঘনায় সহসা অন্ধকার,*
*সাহসী হৃদয়, হারায়ো না তবু ধৈর্য,*
*সন্দেহ নাই খুলবে জয়ের দ্বার।’*[১]

সামাজিক কোনো সুস্থির মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় ক্ষেত্রে বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব পরস্পরের বিপরীত নয়, এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষ দিক রয়েছে। ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের নাশের জন্য অবতাররূপ পুরুষের আবির্ভাবই ধর্মবিপ্লবতুল্য। অধর্মের নাশ হতেই জাতিভেদের নিগড় ভেঙেছে- বুদ্ধদেব জাতপাতের গণ্ডি ভেঙেছেন, চৈতন্য ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ’ বলেছেন, তাঁরা সত্যনিষ্ঠ ও মুক্তিপন্থী রীতিতে ধর্মের

মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের মহিমা স্বীকৃতিতে বিপ্লব এনেছেন- যে বিপ্লবের প্রধান অর্থই মূল্যবোধের পরিবর্তন, যার মূলে থাকতে হবে স্বার্থপ্রেরণা।

এই প্রেরণার তরঙ্গাঘাতে একসঙ্গে ঘুম ভেঙেছিল অনেকেরই। দারুণ ভাঙনের মুখে সম্মুখসারি বহু মনীষীই সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন নতুন করে জীবন রচনার মহান দায়িত্ববোধে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন একজনেই - সেই নরেন্দ্রনাথ, যাঁকে আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ রূপে- তিনিই আধুনিক প্রাণ রঙ্গমঞ্চে মাথা উঁচু করে স্বনির্ভর দাঁড়াবার স্বাধিকার তুলে দিয়েছিলেন জাতির বিদীর্ণ শীর্ণ পাণ্ডুর করপুটে। ভালোবাসার মহানমন্দ্রে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নের মধ্যে নিয়ে এলেন সমন্বয়ের সুস্থ সুন্দর প্রাগ্রসর জীবনচেতনা। তারই প্রকাশ ঘটেছে বিবেকানন্দের লেখনী মুখে- যেখানে গবেষণাশীল বিশ্লেষণ ও তথ্যের বিবৃতিতে ভারতীয় ধর্মদর্শনের মাপকাঠিতে গণবিপ্লবের সার্থক জাগরণের দিকটি যেমন তিনি তুলে ধরেছেন, তেমনি মানবাত্মার সুস্থির সিদ্ধান্তকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

ভারতের বর্ণাশ্রমে চতুবর্গের যে বিভাজন, তা সামাজিক মানসিকতাকে চারটি ভাগে খণ্ডিত করেছে। পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) ও মজুর (শুদ্র) সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির ও দর্শনের পার্থক্যটি স্বল্পসংক্ষিপ্ত পরিচায়নে তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ। যেখানে ব্রাহ্মণ বললেন- 'বিদ্যা সকলবলের বল আমি, সেই বিদ্যা উপজীবী, সমাজ আমার অনুশাসনে চলিবে'[২] আবার ক্ষত্রিয়দের পরিচয়- "আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাইত, আমিই শ্রেষ্ঠ"।[৩] বৈশ্য বললেন- "'উন্মাদ! অখন্ড মঙ্গলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং'- মুদ্রারূপী অখন্ড শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ তোমার জপতপ বিচারবুদ্ধি ইহারই প্রসঙ্গে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য- ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে।... যথাকালে আমি পশ্চাদেশ হইতে সমত মধু নিপীড়ন করিয়া লইতেছি।"[৪] আর শূদ্র!- 'যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব।... সমাজের সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বকালে সর্বদেশে 'জঘন্য প্রভবো হিঃ সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি' ভরাল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল"[৫]- অথচ কখনোই ভোলার নয় এই ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্তের- "এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষ্য অতিগভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ"[৬]- সেই ইতিহাসকে।

বিশাল ব্যপ্ত মহিমাময় সেই মহাভারতীয় সভ্যতার কি করে এমন বিনষ্টির অন্ধকারে অধপতন ঘটল সে ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং জটিল- তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ ও নেই এখানে। এককথায় বলা চলে ইহজীবনের প্রতি প্রচণ্ড অনীহাই সেই সমন্বিত মহাজীবনের থেকে পতনের মূলীভূত কারণ, আর হিন্দুধর্মে- (থাকে বলা হয় বেদান্ত বিহিত বৈদিক ধর্ম) ঘুন-ধরা সংস্কারের বিস্তার বেশি বই কম ছিল না। অধ্যাপক নির্মল বসুর ভাষায়- "পৃথিবীতে কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় মানবতার মহিমা এরূপ উচ্চভাবে ঘোষণা করে নাই, আবার পৃথিবীর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন এবং দরিদ্রশ্রেণিকে পদদলিত করে নাই।"[৭] এই ইতিবৃত্তকে সামনে রেখেই বিবেকানন্দ ব্যক্ত করেছিলেন সত্যের এক সুর-

*".... জীবন্ত যতো ঈশ্বর ফেলে,*
*বিশ্বে ছড়ানো তাঁর অনন্ত প্রকাশ ছেড়ে*
*কল্পিত ছায়া খুঁজে কোথা ফেরো*
*তাতে কড়ে শুধু কলহ এবং বিসংবাদই।*

*সব ছেড়ে তুমি জীবন্ত ঐ ঈশ্বর দেখ*
*তাঁরই উপাসনা করো ভেঙে ফেলো*
*মূর্তি যতো।"*[৮]

প্রত্যেক শাসনকালেই এই ভারতের মাটিতে দোষ-গুণ দুটিই বর্তমান ছিল। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিক বেড়া দেওয়া থাকে, তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার আর কারও নেই। এমনকি- "মানববলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিত বর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর, কখনো বিভীষিকাসঙ্কুল আদেশ, কখনো সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনো কৌশলময় নীতিজাল বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে।"[৯] - তবে এই যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এসময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয় কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, তাঁদের শাসনই শিল্প ও সামাজিক কৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল, তারপর এল বৈশ্যযুগ- এক দুর্ধর্ষ শক্তি (ইংলেণ্ডের ভারতাধিকার)- "যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গ-তরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে একদেশের পণ্য অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান।"[১০] - এ যুগের সুবিধা এই যে পূর্বোক্ত দুই যুগের ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃত লাভ করে। সংসার সমুদ্রে সর্বজয়ী এরা, মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনারাশির মধ্যে যাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আর সমাজের যে নিত্যবিধান- বলবানের দিকে যাওয়ার আকর্ষণ- দুর্বল মাত্রেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গায়ে কোনো প্রকারে লাগানো- আর তার তাগিদেই সমগ্র ভারত একদিন নেচে উঠল। কিন্তু এই শক্তির (বৈশ্য/ ইংলেণ্ড শক্তি) ভেতরেই যে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে স্থির ও প্রশান্তভাব- বড় ভয়াবহ। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ যদিও আরো বেশি উদার। কিন্তু এসময়েই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ মোহে ভারতের সমস্ত সংস্কারকে, আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন দিতে উদ্যত যুবসমাজ। ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে নতুন ধরনের শিক্ষা দীক্ষায় জীবনদর্শন সক্রিয় হয়েছিল। ইসলামের তলোবার আর তসবি পাশ্চাত্যের বিপুল শক্তিকে পরাজিত করতে পারেনি- তাই ভারতও মত্ত হয়ে উঠল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অকপটে বরণ করতে তারা ভেবেছিলেন পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের মধ্যেই যথার্থ মুক্তি তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবাধ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমস্ত ঐতিহ্যকে মুছে ফেলতে চাইছে যুব প্রজন্ম, তখন যেন - "সর্বত্র একটা উদ্দাম চঞ্চলতা আকুল করেছিল সমগ্র জাতির মানস চৈতন্য, দিকে দিকে নানাভাবে সেদিন ঘটেছিল তার বিচিত্র আত্মপ্রকাশ।"[১১] কিন্তু জাতির পুরনো কুলধর্মের সঙ্গে নাড়ীর অচ্ছেদ্য বন্ধনকে উৎপাটিত করলে যে- তার কোনো সক্রিয়তা থাকে না। -উড্ডীন পাখির মত তারও কোনো স্থায়িত্ব নেই এমন উশৃঙ্খল, ছিন্নমস্তা রূপধারী সমাজকে অবশেষে স্বদেশপ্রেমের সৃষ্টতায় স্নাত করবে দাঁড়াতে হলো এক ভারতীয়কেই সেই বিবেকানন্দকে।

ধর্মকে কেন্দ্র করেই আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল আর ধর্মকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মান্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে একটি সুস্থ সুন্দর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে জাতির চেতনায় প্রাণ সঞ্চার করা ও তাকে সমন্বয়ী এক সার্বভৌম জীবনের অভিমুখী করা- এই সত্য এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি বিবেকানন্দ, ব্রাহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই পর্যায়ক্রমে যাঁরা জীবনকে ক্রমবিকশিতরূপে দেখেছিলেন তাঁরা

ফুলকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন ফুলের পরিণতি যেমন ফলে, তেমনি সম্ভোগের পরিণতি পরিপূর্ণ ত্যাগে। জীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিতে নিরাসক্ত মনেরই অধিকার। তাই বিবেকানন্দ সর্বদাই আত্মজাগরণের কথা বলেছেন আর এই জাগরণের পটভূমি হবে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, ধর্মের বাঁধনে দৃঢ়বদ্ধ আর সমন্বয়ের সূত্রে একতাবদ্ধ এবং তা একসময় সম্ভব হয়ে উঠেছিল যুগসন্ন্যাসীর সুদূরব্যাপী সেইসব বাণী ও রচনার দ্বারা। আবার এই বাণীরই অনুরণন ঘটেছে রবীন্দ্র লেখার মধ্যে-

*"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা*
*ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"*[১২]

সমন্বয় প্রাণ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বহু সাধকেরই আবির্ভাব ঘটেছিল, আর আধুনিক প্রাণ বিবেকানন্দের আগমন অর্থাৎ নরেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দের যে যাত্রা তা সম্পন্ন হয়েছিল যুগান্তকারী মহাপুরুষ রামকৃষ্ণের সংস্পর্শ লাভেই। রামমোহনের যে জাগরণের শুরু, তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হল শ্রীরামকৃষ্ণে- আর উত্তর সাধক স্বামীজি গুরুর জীবনরূপী সূত্রকে নিজের কর্ম জীবনে ভাষ্যের ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময় করে তুলেছিলেন। অনৈক্য ও ব্যবধানের মাত্রা বেড়ে গিয়ে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৃহদংশের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে একটা হীনমন্যতাবোধ ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করল- তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য সাধনার বলে হিন্দুর লৌকিক ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মকে, আধ্যাত্মিকতার হারানো সুর ফিরিয়ে আনলেন হিন্দুর পূজার মধ্যে, সহজ-সরল কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনার সুর প্রকাশ করলেন। সকল ধর্মের জন্য অমূল্য বাণী দান করলেন- "যত মত তত পথ"- আর বিবেকানন্দ ধর্মাশ্রয়ী পূর্ণজাগরণ সমন্বয়ে পশ্চিমকে সাদরে গ্রহণ করে গৌরবান্বিত ভারতীয় হয়ে থাকার সূত্র সমগ্র কর্ম জীবনে বলিষ্ঠ করে তুললেন। তখনই ভারত তার হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের এক নব ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হল- আদর্শনিষ্ঠ তরুণ সমাজ এক অপূর্ব উন্মাদনায় আপসহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহাশক্তিধর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, স্বাধিকার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। স্বামীজী বলেছিলেন- "If you faith in the three hundred and thirty millions of your my theological gods, and in all the gods which foreigners have introduced into your midst. And still no faith in yourselves … stand upon that faith and be story." [১৩]

সর্বাত্মক সমগ্র পরিপূর্ণ জীবনের উদ্বোধনই আমাদের সাধনা। এই কারণেই - "দেবতারে মোরা আত্মীয় বলে জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি, আমাদেরই এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি"[১৪]- কেবল কবিকথন নয়, জীবনানুগ বাস্তব সত্য। করুণার অভিন্ন মিলন এদেশের মাটিতে চিরকাল সম্ভব হয়েছে- তাই কবি লিখছেন—

*"ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি। ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান দুর্গমের পথিকের আতিথ্য করিতে তব দান বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।"*[১৫]

এই প্রসঙ্গে এবার টানছি শূদ্র জাগরণের কথা, যাদের আমরা ঘৃণা করি অথচ তারাই সমাজ নামক যে এক অবয়ব তার রক্ষাকর্তা, অথচ সেই শূদ্রই সমাজের অপাংক্তেয় জীব। জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি তাকেই তারা বেদনার তক্ততম রসে পূর্ণ এক পাত্র হিসেবে জানে এবং অনায়াসে তা ধারণ করে, সর্বরিক্ততার বুক ভাঙা কান্না ভেসে যায় আত্মোৎসর্গের অনির্বচনীয়তায়। যাদের জীবনের চরম উত্তর লাভ হয় যেন বিধাতারই অমোঘ বিধানে অর্থাৎ বলিপ্রদত্ত। অথচ এই আত্ম ত্যাগই ভারতের প্রত্যেক মানুষেরই আদর্শ ছিল। স্বামীজী বলেছেন- "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"[১৬] স্বামীজীর এই বাণীই হয়তো একদিন শত শত বিপ্লবীর অন্তরে প্রেরণার আগুন

জ্বালিয়েছিল। তবে এ আহ্বান শুধু স্বদেশ-জননীর উদ্দেশ্যে আত্মদানের আহ্বানই নয়, পরমসত্যের উন্মোচনই আমাদের অন্তরে ধ্বনিত করতে চেয়েছেন তিনি।

ভারতের লক্ষ্য ছিল পরমসত্যের অভিমুখী। তাই জীবন যাপনকে আমরা উপায় বলে জেনেছি- একে কখনোই উদ্দেশ্য মনে করিনি। ভারতের আদর্শ গৃহী, আদর্শ প্রেমিক উমানাথ শঙ্কর তাই সর্বত্যাগী।

সংসার বা সন্ন্যাস- কিছুই এ ভারতের বৈরাগ্যের বাইরে নয়। কিন্তু মানুষ যত অর্থ, পদ, দেহসুখ- এদের দাম হয়েছে সত্য ততই তার কাছে এক কঠিন বলয়ের দ্বারা ব্যবধান রক্ষা করেছে। যেখানে বৃহদাংশ নিপীড়ন, উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তায় হয়েছে অন্ধ। সেখানেই এক শ্রেণি হয়েছে সর্বহারা। কিন্তু যেভাবে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য চাই পরিমিত ইন্দ্রিয়চর্চা সেভাবে ইন্দ্রিয়তীত সত্যের জন্য চাই ইন্দ্রিয়মগ্নতার অবসান। স্বামীজীর ভাষায়- 'স্বার্থই স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষক।'

ইতিহাস বলছে এক অংশকে পিছিয়ে কখনই সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয়। নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর' তাদেরও যে একটিই পরিচয়- তারাও মানুষ। মানুষের ধর্মচেতনাই হলো আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন, এই ধর্মবোধ কেবল ভারতের নয়, সমস্ত জগতেরই, যে ধর্ম শাস্ত্র বা মহাপুরুষের নামাবলী ধারণ করে- অর্থ, সম্পদ বা শোষণের মগ্ন তা কোনো কালেই ধর্ম নয়। ধর্মের বিকৃতিই আফিম হতে পারে, কিন্তু যে ধর্মের আহ্বানে বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণের মতো সর্বত্যাগী অথচ বিশ্বপ্রেমিক মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে, সে ধর্ম মানবচৈতন্যের সমস্ত শুভপ্রয়াসের প্রেরণাদাতা। আর সেই মানবচৈতন্যের ধর্মবোধের শুদ্ধস্নাত রূপ হলো ভারতসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যিনি জানতেন সেই যুগ অতি সন্নিকট- যেদিন শূদ্ররা হয়ে উঠবে বলিষ্ঠ কেবল কর্মেই নয়, আত্মমর্যাদাতেও। সেদিনই মানবপ্রেমের জয়ডঙ্কা সমস্ত পৃথিবীতে হবে ধ্বনিত আর তাই হবে আমাদের জীবনের গতি সঞ্চারের মাধ্যম।

জীবনের তো সর্বস্তরেই সংগ্রাম রণক্ষেত্রে, জীবনবিকাশে, আধ্যাত্ম সাধনায়। তাই ক্ষয়ক্ষতি দুঃখ মৃত্যুর মূল্য না দিয়ে শূদ্রদেরও নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে- আর তার এই আত্মউন্মোচনই হবে ঈশ্বরের প্রতি তাদের অঞ্জলি প্রদান।

বিবেকানন্দ লিখছেন- "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময় মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[১৭] জ্ঞানের রাজ্যের ঐক্যবোধ চেতনাকে বিবেকানন্দ প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবন সত্যে পরিণত করেছিলেন। তাই তাঁর জীবনে, রচনায়, কথোপকথনে, পত্রাবলীতে অনুভূত হয় প্রেমের বিদ্যুৎস্পর্শ- এই স্পর্শই উদভ্রান্ত সমাজে এনেছিল শান্তির প্রলেপ। ইনিই হলেন বিবেকানন্দ বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী যাঁর সম্মুখে দাঁড়াবার মত ভারতের মাটিতে তখন কোনো নারী ছিলেন না, তাঁকে আসতে হয়েছিল সুদূর বিদেশ থেকে (ভগিনী নিবেদিতা) ।

**তথ্যসূত্র:**

(১) বিবেকানন্দ, স্বামী, উল্লিখিত ভদ্র, কালিদাস (সম্পা), 'অমৃত বাণী বিতান', কলকাতা, এস. বি. এস পাবলিকেশন, বইমেলা ২০১৬, পৃঃ ৭৮

(২) বিবেকানন্দ, স্বামী, 'বর্তমান ভারত', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩দশ সং ১৯৫২, পৃঃ ১১

(৩) তদেব, পৃঃ ১৩

(৪) তদেব, পৃঃ ১৪

(৫) তদেব, পৃঃ ১৭

(৬) বিবেকানন্দ, স্বামী, 'ভাববার কথা', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১২দশ সং ১৯৬২, পৃঃ ৮

(৭) বসু, নির্মলেন্দু, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজ সংস্কার', কলকাতা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৪, পৃঃ ৫

(৮) বিবেকানন্দ, স্বামী, 'স্বামী বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র', কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২১তম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, পৃঃ ২৭

(৯) বিবেকানন্দ, স্বামী, 'বর্তমান ভারত', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১

(১০) তদেব, পৃঃ ৮

(১১) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অব কালচার, 'চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ' কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪

(১২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত, ১৩৯৫, পৃঃ ১১১

(১৩) Das Gupta, R.K., 'Swami Vivekananda On Indian Philosophy And Literature', Calcutta, Ramakrishna Mission Institute and Culture Gol park, 5th print. Dec. 2015, p. 100

(১৪) সেনগুপ্ত, প্রদ্যোত, 'বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত', কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯০২, পৃঃ ২৯

(১৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চয়িতা/ জন্মদিন', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ৭ম সং, ১৩৭৬, পৃঃ ১২৯।

(১৬) উল্লিখিত, ঘোষ, প্রণব রঞ্জন, 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৬৯, পৃঃ ৫৬

(১৭) বিবেকানন্দ, স্বামী, 'স্বামী বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র', সবারপ্রতি, কলকাতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪